প্রধানমন্ত্রীর অনন্য উদ্যোগ, একশ’ অর্থনৈতিক অঞ্চল বদলে দিচ্ছে দেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশে গত ২৫ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ৫০ শতাংশের বেশি। ২০২০ সালের মে মাসেরএশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি তাদের এক প্রতিবেদনে দিচ্ছে এই তথ্য। এছাড়া ওই প্রতিবিদনে বলা হয়, গত দশ বছরে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছয় শতাংশের ওপরেই থাকছে। এর পরের বছরই দেশের মানুষের এমন অর্থৈনৈতিক সাফল্যে, মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। এই শুভক্ষণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, এই সাফল্যের সিংহভাগ এসেছে শেখ হাসিনা সরকারের উৎপাদন এবং বিনিয়োগবান্ধব উদ্যোগের ফলে। তিনি পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এই যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি সব সময়ই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। ২০১৩ সালে শুরু হয় এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল কাজ। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ শুরু করেন। শুরু থেকেই বেজার লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উত্পাদন এবং রপ্তানী বাড়ানো। পাশাপাশি পরিকল্পিত উপায়ে দেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ।

বেজার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মোট ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৯৭টির জন্যেই গর্ভনিং বোর্ডের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থৈনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে চট্টগ্রামের মীরসরাই সীতাকুণ্ড এবং ফেনি মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। এর আয়তন প্রায় ৩০ হাজার একর । এটিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম একটি শিল্পনগর ভাবা হচ্ছে। এই শিল্পনগরীর মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। শুরু হয়েছে অবকাঠামো নির্মাণ। এই শিল্প নগরে একটি পূর্ণাঙ্গ শহরের সম্ভাব্য সব নাগরিক সুবিধা থাকবে। বিশেষজ্ঞরা আরও জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে আগামী ২০ বছরে প্রায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নির্মাণ হচ্ছে দুটি অঞ্চল। ভারতের জন্য থাকছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের একটি অংশ ও মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল। সৌদি আরব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে একটি অঞ্চল করার প্রস্তাব দিয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কিছু প্রতিষ্ঠান উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশ্ব মহামারী করোনার সংক্রমনের সময়েও এখানে বিনিয়োগ হয় ৬ মিলিয়ন ডলার। এমনকি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা ছিল সেটিও সত্য হয়নি।

বিনিয়োগকারীদের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা দেয়ার জন্যে জাইকার কারিগরি সহায়তায় একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বিনিয়োগকারীদের ১২৫ ধরণের সেবা দেয়া হচ্ছে। যার মধ্যে ১৭ টি সেবা অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অনলাইনে সেবা আরো বাড়ানো হচ্ছে।

এছাড়াও অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় কক্সবাজারে তিনটি ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে । এগুলো হচ্ছে সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক । সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কটি হবে মহেশখালীর চর মকবুল, চর ভরাট ও সমুদ্র বিলাস এলাকায়। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত ট্যুরিজম পার্ক। টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদীর পাড়ে মনোরম জালিয়া দ্বীপে প্রতিষ্ঠা হবে এই পার্ক। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলার সাগর তীরে।

এসব পার্কে পাঁচতারকা হোটেল, ইকো-ট্যুরিজম, মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম, সি-ক্রুজ, ভাসমান জেটি, শিশু পার্ক, পানির তলদেশে রেস্টুরেন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্ট, ঝুলন্ত সেতুসহ বিনোদনের নানা বিষয় যুক্ত করার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে পার্কগুলোতে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠা হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

পদ্মা সেতুর আয় হাজার কোটি টাকা ছাড়াল

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের দ্বার পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে প্রায় এক বছর তিন মাস আগে। এখন পর্যন্ত পদ্মা সেতু থেকে টোল আদায় হয়েছে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি। সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, প্রতিদিন গড়ে ১৫ হাজার যান চলাচল করে পদ্মা সেতু দিয়ে। আর তাতে প্রতিদিন গড়ে ২ কোটি ১৫ লাখ টাকার মতো টোল আদায় হয় পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তের টোল প্লাজা থেকে।

গত বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরদিন ২৬শে জুন পদ্মা সেতু জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ২০২২ সালের ২৬ জুন থেকে বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মাওয়া ও জাজিরার দুই টোল প্লাজায় ৭২ লাখ ৯৬ হাজার ৬২২টি যানবাহন সেতু অতিক্রম করে। এতে এখন পর্যন্ত ক্রেডিট ও ইটিসিএসসহ এক হাজার কোটি ৯২ হাজার ১৫০ টাকা টোল আদায় হয়েছে।

সেতু কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, একদিনে সর্বোচ্চ টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত । সেদিন ৩৫ হাজার ৫২৪ যানবাহন পদ্মা সেতু অতিক্রম করে। ওই দিন মাওয়া প্রান্তে টোল আদায় হয়েছিল ২ কোটি ২৩ লাখ ৪৯ হাজার ১০০ টাকা এবং জাজিরা প্রান্তে টোল আদায় হয়েছিল ১ কোটি ৬৮ লাখ ৯০০ টাকা।

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর ২০২২ সালের ২৫ জুন থেকে ২০২৩ সালের ২৪ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত পদ্মা সেতু দিয়ে মোট ৫৬ লাখ ৭৫ হাজার যানবাহন পারাপার হয়েছে। এসব থেকে মোট আয় হয়েছে ৭৯৮ কোটি ২৩ লাখ ৯৬ টাকা। তার প্রায় তিন মাস পর হাজার কোটি টাকা ছাড়াল এই আয়।

৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার উন্নয়নের সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু দিয়েচলবে ট্রেন। আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে রেল

চলাচল শুরু হবে। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন এই রেলপথের উদ্বোধন করবেন। পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চলাচলের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে প্রথম বছরেই সেতু বিভাগকে দিতে হবে ১০৬ কোটি টাকা। এ থেকেও আয় আসবে পদ্মা সেতুর।

দেশের সবচেয়ে দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় মূলত অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ঋণ হিসেবে দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আদায় হওয়া টোল থেকে গত ৫ এপ্রিল প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৩১৬ কোটি ৯০ লাখ ৯৭ হাজার ৪৯ টাকা সরকারকে পরিশোধ করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

করোনায় মোকাবেলায় সরকারের চেষ্টা ছিল সর্বাত্মক

করোনাকালের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়। ২০২০ সালের গোড়ার দিকে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ মহামারী লেগেছিল। ইউরোপের দেশে দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন। ইউরোপ ছাড়িয়ে সেই মড়ক লেগে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশে। ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশ থেকে যে করোনার সূত্রপাত সেটি উহান ছাড়িয়ে চীনের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় দাবানলের মত। তারপর সুপারসনিক গতিতে বিশ্বকে শাসন করতে শুরু করে। মাত্র কয়েক মাসে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সেই মহামারী বাংলাদেশেও আঘাত হানে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। তারপর ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। পরিস্তিতি জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করে। পুরো বিশ্ব যেখানে কোভিড-১৯ নিয়ে চরম অস্থিরতার মধ্যে তখন বাংলাদেশের সামনে কোভিডের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু বাঙালি যে দমবার পাত্র নয়।

বিশ্বজুড়ে কোভিডের টিকা আবিস্কারের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব দ্রুত সেই টিকা আবিস্কারে মনোযোগ দিলো।

টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ওই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে প্রথম ধাপের টিকা কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে টিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ দেওয়া হয়। এখন চতুর্থ ডোজের কার্যক্রম চলমান।

বিশ্বব্যাপী যখন করোনায় লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তখন বাংলাদেশে সেই হার খুবই কম। শেখ হাসিনার সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টায় মহামারীর মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাতে সফলতাও এসেছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশংসিত হয়েছেন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য সম্মাননা পেলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য জাতিসংঘ স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এই বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে বলা হয়েছে, “জাতিসংঘ কর্তৃক ‘শেখ হাসিনা উদ্যোগ’-এর সাম্প্রতিক স্বীকৃতির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন।” এতে আরও বলা হয়, “কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার একটি সফল মডেল: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিধির জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি।”

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ারেন অ্যালপার্ট মেডিকেল স্কুলের মেডিসিন অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডিন ডা. মুকেশ কে. জৈন এখানে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অবস্থানস্থল দি লোটে নিউইয়র্ক হোটেলে প্রশংসাপত্রটি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মো. নূরেএলাহি মিনা এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, “ব্রাউনের ওয়ারেন অ্যালপার্ট মেডিকেল স্কুল কমিউনিটি ক্লিনিক মডেলের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে তার স্বীকৃতির জন্য বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে।” প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময়, ড. জৈন জনস্বাস্থ্য ও গবেষণার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সম্ভাব্য প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ-ব্রাউন বায়োমেডিকেল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং এর প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে চিকিৎসা ও ক্লিনিক্যাল গবেষণার উন্নয়নের ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, “আমরা সবসময় গবেষণাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে। ”ব্রাউন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের পরীক্ষা করছে। ড. জৈন আরও বলেন, তারা ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী রোগীদের রেকর্ড রাখার জন্য বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিককে ইলেকট্রনিক ডেটা ম্যানেজমেন্ট চালু করতে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটি গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে একটি অংশীদারিত্ব গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এসডিজি অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইবেন শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনের মূল পর্ব শুরু হয়েছে। টানা পনেরো বারের মতো এই সম্মেলনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে আছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত আগেই সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন এবং বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে এবারের অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। বৈশ্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা এবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রাধান্য পাবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতারা জানান, আগের যেকোনো বারের সফরের চেয়ে এ সফর অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ।

মুহিত আরও বলেন, বৈশ্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা এবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রাধান্য পাবে। এছাড়া বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যখাতে সাফল্য ইত্যাদি বিষয় নিয়েও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, নিরাপদ অভিবাসন, বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক সংকট, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়গুলোও উঠে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের বিষয়টি জানাবেন বিশেষভাবে। পাশাপাশি এসব অর্জনের ধারবাহিকতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কামনা করবেন। সারা বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের জন্যে জাতিসংঘের উদ্যোগ ‘এসডিএসএন’ বাংলাদেশ অংশের গবেষণা অুনযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধা মুক্তি, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, গুণগত শিক্ষাসহ ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চলছে। এবার এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ‘আস্থা পুনর্গঠন ও বিশ্ব সংহতির পুনরুদ্ধার : সবার জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব ত্বরান্বিত করায় ২০৩০ এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ’।

এসডিএসএন’ এর গবেষণা বলছে, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম। যেটি গতবছর ১৬৩টি দেশের মধ্যে ছিল ১০৪তম অবস্থানে। ২০১৭ সালে ১৫৭টি দেশের মধ্যে অবস্থান ছিল ১২০তম। ২০২০ সালে বৈশ্বিক র্যাংকিং ছিল ১৬৬টি দেশের মধ্যে ১০৯তম। এসডিজিতে বাংলাদেশের কান্ট্রি স্কোর ৬৫.৯।

‘এসডিএসএন’- এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুণগত শিক্ষা এবং পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথে আছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য বিলোপের ক্ষেত্রে পরিমিত রূপে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ক্ষুধা মুক্তির ক্ষেত্রে অপুষ্টি হ্রাসে ২০২০ সাল পর্যন্ত অগ্রগতির হার ১১.৪, যা এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের পথেই রয়েছে। প্রতি হেক্টরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ২০২১ সাল পর্যন্ত অগ্রগতির হার ৫.০, এটিও এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে।

সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ শিরোনামে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মায়ের মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ খুবই ভালো করেছে। নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রেও ২০২১ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন বেশ সন্তোষজনক। এইডস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেও বাংলাদেশ সফল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশে টিকাপ্রাপ্ত শিশুদের সুস্থ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সাফল্যের হার ৯৭, যা এসডিআর রিপোর্ট অনুযায়ী সন্তোষজনক। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত লক্ষ্যে সুপেয় পানি পান ও ব্যবহার নিশ্চিতে ২০২০ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশ এসডিজি লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং এই সাফল্য ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

সপ্তম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানিতে ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বড় সাফল্য জনগণের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানো। জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণেও ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন সন্তোষজনক ।

শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোর লক্ষ্য অর্জনে সামগ্রিকভাবে পরিমিত রূপে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারে ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী এসডিজি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাণিজ্যিক এবং যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণেও ২০১৮ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশ একইরকম সাফল্য দেখাতে পেরেছে।

মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন এক নম্বর প্রায়োরিটি ইস্যু। এই বক্তব্য আবারও বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে একটি সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১টি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং বেশ কয়েকটি দেশ ও সংস্থার প্রধানরা দ্বিপাক্ষিক সভা করবেন।

সবখানেই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে সবার সহায়তা চাইবেন।

এবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৫০ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন শেখ হাসিনা। এরই মধ্যে মূল বিতর্ক পর্ব শুরু হয়েছে । অধিবেশন চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবছরের মতো এবারও মূল অধিবেশনে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) শেখ হাসিনা বাংলায় ভাষণ দেবেন।

কেন ইইউ এর রেজুলেশন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে?

২০২৪ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের উপর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে (ইইউ) আলোচনা হয়েছে যা বিভিন্ন মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একই সাথে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকারের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি মামলা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে এই সংগঠনের প্রধানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ধরণের আলোচনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমানা পেরিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেগ করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য প্রশংসনীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের একটি রেজোলিউশন সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় কিনা তা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।
এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি তাদের কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সংস্থাগুলি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নজরদারি করতে পারে। যাইহোক, বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্থা-অধিকার এর মামলাটি ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামীর সমাবেশে মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগকে

দূরদর্শী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল দেশে পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই লক্ষ্য পূরণে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়ন এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ’ তৈরি করা হয়েছে। এর চারটি স্তম্ভ রয়েছে: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নেন্স।

বাংলাদেশ একটি দেশ তার স্থিতিস্থাপকতা এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিচিত, এখন তার পরবর্তী মিশন শুরু করছে: একটি স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়া। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এই মিশনের লক্ষ্য জাতিকে একটি ডিজিটালভাবে উন্নত, সংযুক্ত এবং টেকসই সমাজে রূপান্তর রাখতে সক্ষম।

স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের একটি মৌলিক স্তম্ভ হল ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন। এর মধ্যে রয়েছে সারা দেশে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বিভাজন দূর করার মাধ্যমে, সরকার ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সম্প্রদায়কে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রচুর তথ্য ও পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য ক্ষমতায়নের লক্ষ্য রাখে।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিশনটি ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়াসহ শিক্ষায় প্রযুক্তির একীকরণের উপর জোর দেয়। তরুণ প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতায় সজ্জিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ একটি প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে পারে যারা উদ্ভাবন চালাতে এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে অবদান

রাখতে সক্ষম।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে, স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের লক্ষ্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অ্যাক্সেস উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা। টেলিমেডিসিন, রিমোট ডায়াগনস্টিকস, এবং ডিজিটাল হেলথ রেকর্ডস হল কিছু উদ্যোগ যা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বাড়ানোর জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডাক্তারদের সাথে রোগীদের সংযুক্ত করার মাধ্যমে, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি এমনকি দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত কোণে পৌঁছাতে পারে, জীবন বাঁচাতে পারে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ফলাফলের উন্নতি করতে পারে।

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ অর্জন এবং মাতৃমৃত্যু, টিকাদান কভারেজ এবং ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে থাকার হারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিকে উন্নত করে, জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চিত্তাকর্ষক সাফল্য অর্জন করেছে। গত চার দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য পরিষেবা অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। বেসরকারি-খাতের পরিষেবাগুলি অনেকের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং স্বাস্থ্যসেবার জন্য পকেটের বাইরে ব্যয় বেশি। এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে বিপ্লবীকরণ এবং বিদ্যমান বাধাগুলিকে মোকাবেলা করার, যার ফলে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেমের পথ প্রশস্ত করা।

মিশনটি শহরগুলিকে স্মার্ট শহরে রূপান্তরিত করার দিকেও জোর দেয়। এতে বুদ্ধিমান পরিবহন ব্যবস্থা, দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্মার্ট এনার্জি গ্রিড সহ স্মার্ট পরিকাঠামো বাস্তবায়ন জড়িত। ডেটা এবং সংযোগের সুবিধার মাধ্যমে, শহরগুলি বাসযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বাড়াতে পারে, শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। সরকারি অফিসে ইলেকট্রনিক ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-নোথি) কাগজবিহীন অফিস ইকোসিস্টেমের দিকে একটি প্রাথমিক অগ্রগতি চিহ্নিত করে। এই ব্যবস্থাটি কেবল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুবিন্যস্ত করেনি বরং কাগজপত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে, যার ফলে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমাগত বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে,

সরকার ডিজিটাল নোথি সিস্টেম (ডি-নোথি) চালু করেছে, ডিজিটাল রূপান্তরকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি কাগজবিহীন অফিস এবং জনসেবা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্যকে একটি স্মার্ট নেশন হওয়ার দিকে দেশের যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে দেখা যেতে পারে। সরকারের দূরদর্শিতা, প্রযুক্তিগত গ্রহণের প্রতিশ্রুতির সাথে, দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্থান দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, তখন স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করে যেখানে দক্ষতা, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থায়িত্বের অভূতপূর্ব উচ্চতা অর্জনের জন্য সমস্ত সেক্টরে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

ই-গভর্নেন্স স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকারি পরিষেবা এবং প্রক্রিয়াগুলিকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, দুর্নীতি হ্রাস করা যেতে পারে এবং নাগরিক-সরকার মিথস্ক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা যেতে পারে। নাগরিক পরিষেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম এবং স্বচ্ছ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াগুলির জন্য অনলাইন পোর্টালগুলি আরও নাগরিক-কেন্দ্রিক এবং জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনের জন্য নেওয়া কিছু উদ্যোগ।

স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনও উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। একটি প্রাণবন্ত স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন সেন্টার, প্রযুক্তি পার্ক এবং বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ প্রযুক্তি-চালিত ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে তার সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে পারে, বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে এবং নাগরিকদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

যাই হোক, স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের সাফল্য নির্ভর করে সরকার, বেসরকারি খাত, শিক্ষাবিদ এবং নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের উপর। এটি একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করে এবং পরিবর্তনশীল ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপের সাথে খাপ খায়।

একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মিশন ভবিষ্যতের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির

প্রতিনিধিত্ব করে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করার, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এবং একটি ডিজিটালি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শহর, ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্যোক্তাদের উপর ফোকাস দিয়ে, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি উন্নত, স্মার্ট ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা কাজ করবো।

লেখক: প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

কৃষিতে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য

২০১৭ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ কোটি ৯৭ লাখ। যা ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৮১ লাখের কিছু বেশি। অর্থাৎ পাঁচ বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ। কিন্তু এই সময়ে জমি বাড়েনি। এর ওপর করোনা পরিস্থিতি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা। অনেক বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা করেছিলেন, বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের দূরদৃষ্টি পদক্ষেপ আর কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বের গড় কৃষি উৎপাদনকে পেছনে ফেলে উপরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২২টি ফসল উৎপাদনে বিশ্বসেরা ১০ দেশের মধ্যে অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ।

কৃষিপণ্যে বিশ্বের শীর্ষ দশে বাংলাদেশ
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, নদী ভাঙ্গনসহ বৈরী আবহাওয়া; কৃষিজমি কমে যাওয়া; জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসেরা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) এর হিসেব মতে, আয়তনে বিশ্বে ৯৪তম দেশ হলেও বাংলাদেশ নিম্নোক্ত ২২ ধরনের ফসল উৎপাদনে শীর্ষ দশে

অবস্থান করছে।

এফএও এর মোট ১৬২টি প্রাথমিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের তালিকায় বাংলাদেশের ৬৮ ধরনের কৃষিপণ্য স্থান পেয়েছে। এ তালিকায় যেমন একক পণ্য আছে, তেমনি সমজাতীয় ও মৌসুমভিত্তিক কয়েকটি পণ্যও আছে। এফএওর হিসাবে, ২০০১ সালে ১১টি পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ দশে ছিল বাংলাদেশ। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এ সংখ্যা আর বাড়েনি। তবে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে ২০১১ সালে পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ দশে স্থান পায় ১৭টি কৃষি পণ্য। এরপর বিভিন্ন বছরে যোগ হয় আরও পাঁচটি কৃষিপণ্য – পেঁয়াজ, কুমড়া, ফুলকপি ও ব্রকলি, পাখির খাদ্য (বীজ) এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত শিমের বিচি। সব মিলিয়ে ২০২১ সালে ২২টি পণ্য উৎপাদনে শীর্ষ তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ।

২২টি কৃষিপণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাট, সুপারি ও শুকনা মরিচ উৎপাদনে। চাল, রসুন। চিনি জাতীয় ফসলে (যেমন জোয়ার) বাংলাদেশ তৃতীয়। জাম, বরই, করমচা, লটকন ইত্যাদি বেরিজাতীয় ফল এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত সুগন্ধি মসলায় চতুর্থ। মসুর ডাল ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল (কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) উৎপাদনে বাংলাদেশ ষষ্ঠ। সপ্তম অবস্থানে রয়েছে পেঁয়াজ, আলু, আদা, বেগুন, শিমের বিচি ও নারকেলের ছোবড়া উৎপাদনে। চা ও কুমড়ায় বাংলাদেশ অষ্টম। আম, পেয়ারা ও গাবজাতীয় ফল, ফুলকপি ও ব্রকলি এবং মটরশুঁটি ও পাখির খাদ্য (বীজ) শ্রেণিতে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

সব মিলিয়ে এফএওর হিসেবে আয়তনে ছোট (বিশ্বের ৯৪তম) হলেও প্রাথমিক কৃষিপণ্য (শুধু ফসল) উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৪তম। শীর্ষে রয়েছে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। এফএওর তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৩ লাখ টন যার বাজার মূল্য ছিল ৩ হাজার ৬১১ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চার লাখ কোটি টাকার সমান।

প্রধান কিছু ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশ ভালো। আমন, আউশ ও বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। কৃষির এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বে গড় উৎপাদনশীলতা প্রায় তিন টন। আর বাংলাদেশে তা ৪ দশমিক ১৫ টন। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ শ্রীলংকায় প্রথমবারের মতো চাল রফতানি শুরু করে সরকার। দুই দফায় প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল

রপ্তানি করা হয়। এছাড়া ৬ মে ২০১৫ বাংলাবান্ধা বন্দর দিয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প কবলিত নেপালে ১০ হাজার টন চাল সাহায্য হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এটা দেশের চাল উৎপাদনের সামর্থ্যরেই বহিঃপ্রকাশ।

দুই দশক আগে আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ ছিল ২০তম দেশ। এরপর কানাডা, তুরস্ক, পোল্যান্ডের মতো ১৩টি দেশকে একে একে পেছনে ফেলে ৭ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এফএওর তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশে আলু উৎপাদিত হয়েছে ৯৮ লাখ টন। মরিচ (শুকনা) উৎপাদনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এক দশকে চীন ও থাইল্যান্ডকে পেছনে ফেলে মরিচ উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠেছে বাংলাদেশ। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে, ২০২১-২২ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে প্রায় ১১৩ কোটি মার্কিন ডলার। সবজি, শুকনা খাবার, মসলা, সুগন্ধি চাল ইত্যাদি কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারের বেশি। গেল ১৪ বছরে কৃষিতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে এর অন্যতম কারণ সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন।

কৃষি উপকরণ সহায়তা: বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, যা দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

সারের ভর্তুকি ও সরবরাহ: বর্তমান সরকার ভর্তুকি দিয়ে চার দফায় সারের দাম কমিয়েছে। গেল সাত বছরে ৪৫.৪৮ লাখ মেট্রিক টন সার আমদানির বিপরীতে ৪২.৪৭ লাখ মেট্রিক টন সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া সার গুদামের ধারণক্ষমতা ৯৮ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১.৫৪ লাখ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
সেচ ভর্তুকি ও কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট: মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচের পানির ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির ভর্তুকি: দেশের হাওড় ও চরাঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে।

কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম: কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায়

বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। আউশে প্রণোদনা প্যাকেজও দিচ্ছে সরকার।

দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবন: বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীগণ মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে লবণসহিষ্ণু নয়টি, খরাসহিষ্ণু দুটি ও বন্যাসহিষ্ণু চারটি ধানের জাত। ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকগণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম জেনেটিকেলি মোডিফাইড ফসল বিটি বেগুনের চারটি জাত অবমুক্ত করে। যার মধ্যে বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জীন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে আলুর নাবি ধসা রোগের প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সব শ্রেণির কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রেসরকারি প্রতিষ্ঠানও দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা দিয়ে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নকে তরান্বিত করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-কৃষি: তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-কৃষি এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষকের জীবনযাত্রা উন্নয়নে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার জানালা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সারাদেশে ৭২৭টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র

(এআইসিসি) স্থাপন করেছে। এছাড়া ২৮ অক্টোবর ২০১৫ ইনফো-সরকার ২৫৪টি উপজেলার ২৫৪টি আইপিএম/ আইসিএম কৃষক ক্লাবকে এআইসিসিতে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি তথ্যকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনলাইনে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১৬১২৩ নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোন করে নামমাত্র খরচে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অফলাইন/অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশিকা প্রদান করছে। আখ চাষিরা মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে ই-পুর্জি সেবা গ্রহণ করছেন। এমনকি ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেশ-বিদেশের কৃষি তথ্য সেবা পাওয়া যাচ্ছে। ‘কৃষকের জানালা’ নামক মোবাইল এপস এর মাধ্যমে কৃষকগণ ছবি দেখে ফসলের রোগ ও পোকামাকড় সনাক্তকরে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে। টেলিভিশন, রেডিও, কমিউনিটি কৃষি রেডিও এর মাধ্যমে কৃষকগণ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পাচ্ছে।

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি: দুই যুগ আগেও বাংলাদেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে দুটি ফসল হচ্ছে। সরকারের যুগোপোযোগী পরিকল্পনা, পরিশ্রমী কৃষক এবং মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানীদের স্বল্প আয়ুষ্কালসম্পন্ন জাত উদ্ভাবণ ও সম্প্রসারণবিদদের সম্প্রসারণ সেবা, ইত্যাদি যৌথ প্রয়াসে দেশে শস্যের নিবিড়তা এখন ১৯৭%, কোন কোন উপজেলায় শস্যের নিবিড়তা এখন ২৫০% এর বেশি।প্রতিবছর আবাদী জমির পরিমান কমে যাওয়া ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান জনগণবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ১৩১৪ ডলার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৫১ শতাংশ (এ যাবৎ কালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। কৃষিতে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন বিশ্বের যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ।

বাংলাদেশের কৃষির এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং এ দেশের কৃষি ও কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের ধারাবাহিতকাও অপরিহার্য।

লেখক: অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সরকার বিদ্যুতের আলো জ্বালাবে আরও দুর্গম দ্বীপে

দেশের পটুয়াখালি জেলার বিচ্ছিন্ন উপজেলা রাঙ্গাবালি একসময় ছিল অন্ধকারে। ভরসা ছিল শুধু সৌর বিদ্যুৎ, মোমবাতি কিংবা হারিকেনের আলোতে। সদর উপজেলা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে বিচ্ছিন্ন এই উপজেলায় নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার। আর তাতে পাল্টে গেছে রাঙ্গাবালির অর্থনীতি। কলকারখানা থেকে শুরু করে নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার খুলে গেছে সেখানে। একই সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে দেশের আরও তিনটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। সেগুলো হচ্ছে- হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ এবং কুতুবদিয়ায়। এর মধ্য দিয়ে এই তিন জনপদে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে নেওয়া এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকে অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – ‘কেউ অন্ধকারে থাকবে না, সব ঘরেই আলো জ্বলবে’। তারই প্রতিফলন এসব দুর্গম এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ।

রাঙ্গাবালী উপজেলার মানুষ সূর্য ডোবার পর ঘর থেকে বের হতেন খুবই কম। নিম্ন আয়ের মানুষ কুপি জ্বালিয়ে এবং মধ্যম আয়ের মানুষ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে কোনোরকম একটি বাতি জ্বালাতেন। গরমে ফ্যান পর্যন্ত চালানোর উপায় ছিল না। অন্ধকারে থাকা এই উপজেলার মানুষ তাই আলোর খোঁজে পাড়ি জমাতেন শহরের দিকে। দুর্গম এই এলাকার মানুষ বিদ্যুৎকে মনে করেন স্বপ্নে দেখা এক আকাঙ্ক্ষা, যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তবে মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। পুরো উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে।

নিঝুমদ্বীপ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপ। প্রায় ১৪ হাজার ৫০ একর আয়তনের এই দ্বীপটি

শীতকালে পর্যটকদের জন্য অন্যতম একটি গন্তব্য। শীতকালে হাজারো অতিথি পাখির আগমন ঘটে। এছাড়া হরিণ দেখার জন্য প্রতিবছর এই দ্বীপে অসংখ্য পর্যটক ছুটে আসেন, করেন রাত্রি যাপন। তবে বিদ্যুৎ না থাকায় তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি এই দ্বীপে আসা পর্যটকরা। সন্ধ্যা হলে বাজারে জ্বলে সৌরবিদ্যুতের আলো, আর তার সঙ্গে অনেকেই লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করেন মোবাইলে চার্জ দেওয়ার জন্য। এই দ্বীপে বিদ্যুৎ পৌঁছালে সাধারন মানুষের জীবনমানের এমন পরিবর্তন আসবে যা আগে কেউ কল্পনা করেনি। বিদ্যুতের ফলে পর্যটকদের জন্য বাড়বে ভালোভাবে থাকার সুবিধা, যা এখন খুবই সামান্য। পর্যটকের আনাগোনা বাড়লে দ্বীপের মানুষের অর্থনৈতিক ভাগ্য ঘুরে দাঁড়াবে।

আয়তন ও জন সংখ্যার দিক থেকে হাতিয়া উপজেলা নোয়াখালী জেলার একটি বৃহত্তম উপজেলা। ২১০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপাঞ্চলে যেতে পাড়ি দিতে হয় বিশাল জলরাশি। এখানে বাস করেন সাড়ে চার লাখেরও বেশি মানুষ। হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপের একটি বড় অংশ ছিল বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত। তাই পর্যটকদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা এমনকি রাত্রিযাপনের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুতুবদিয়া কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ উপজেলা। নানান রকম বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ এই দ্বীপটির আয়তন প্রায় ২১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই দ্বীপে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সমুদ্র সৈকত, লবণ চাষ, বাতিঘর এবং কুতুব আউলিয়ার মাজার। এখানেও বিভিন্ন সময়ে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। তবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং সুযোগ সুবিধা কম থাকায় সেখানে দিনে গিয়ে দিনে চলে আসেন বেশিরভাগ পর্যটক।
‘হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)।

সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেওয়া ৩৮৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলতি ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়িয়ে ২০২৫ সালের জুলাই মেয়াদে শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করে একনেক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, হাতিয়া দ্বীপ শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা, সাবমেরিন ক্যাবল

দ্বারা মুকতারিয়া-নিঝুমদ্বীপ খাল পারাপার করে নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া চ্যানেল পারাপার করে কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা এবং হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপের শতভাগ গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

এদিকে পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পের কর্মপরিধিতে পরিবর্তন ও বিভিন্ন অঙ্গে ব্যয় কমানো-বাড়ানো এবং প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করায় প্রকল্পে সংশোধনী এনেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। সংশোধিত প্রস্তাবে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সালে থেকে বাড়িয়ে ২০২৫ সাল এবং ব্যয় ৩৮৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৪৭ কোটি ১২ লাখ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ৫৯৭ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেবে ৫০ কোটি টাকা। নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলার হাতিয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলা জুড়ে বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পটি।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র আরও জানিয়েছে, প্রকল্পের আওতায় নতুন ৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ (হাতিয়া দ্বীপে ৩টি ও কুতুবদিয়া দ্বীপে ১টি), মুকতারিয়া-নিঝুমদ্বীপ খালে দেড় কিলোমিটার ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে। কুতুবদিয়া চ্যানেলে ৫ কিলোমিটার ডাবল সার্কিট ৩৩ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে। নতুন মোট ১ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হবে। বিদ্যমান ৩৫ কিলোমিটার বিতরণ লাইন রেনোভেশন করা হবে। মোট ৩ হাজার ২৫০টি পোল মাউন্টেড বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে এবং অফিস ভবন কাম রেস্ট হাউজ, ডরমিটরি, সীমানা দেওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

একনেকের অনুমোদন সুপারিশ করে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) আওতাধীন হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন নিশ্চিত করে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও সেবার গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]! [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]! [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]